নব মূল্যায়নে
নজরুল গীতি ও স্বরলিপি

সুকুমার মিত্র

সম্পাদনা ও ভূমিকা

ড. বাঁধন সেনগুপ্ত

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

শিল্পী সুকুমার মিত্র যে বছর জন্মগ্রহণ (জন্ম ঃ ১ ডিসেম্বর, ১৯২৮) করেছিলেন তার মাত্র বছর তিনেক আগেই (সেপ্টেম্বর, ১৯২৫) প্রকাশিত হয় নজরুলের লেখা প্রথম রেকর্ডের গান 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' ও 'শিকল পরা ছল'। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে (H.M.V.) প্রকাশিত সেই গানের গায়ক সেকালের নামকরা শিল্পী হরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরে কবি সরাসরি ১৯২৮ সালেই সুরকার, গীতিকার ও ট্রেনার হিসেবে গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেন। প্রথম গানের রেকর্ডে (হরেন্দ্রনাথ দত্ত) গীতিকার নজরুলের নাম ছিল না। সেকালের বিবেচনায় তা প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই। কিন্তু রেকর্ডটির চাহিদা ও জনপ্রিয়তা লক্ষ করে অবশেষে কোম্পানি প্রায় বাধ্য হয়ে গায়ক-অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ দাসের মাধ্যমে বিদ্রোহী কবিকে সেদিন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন সবে এসেছেন নজরুল তাঁর কৃষ্ণনগরের আবাস ছেড়ে। সপরিবার উঠেছেন জেলিয়াটোলায় গায়ক বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে। সেখানেই গ্রামোফোন কোম্পানির ম্যানেজার ভগবতী ভট্টাচার্যকে নিয়ে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শিল্পী ধীরেন দাস। অনেক আলোচনা ও তর্কাতর্কির পর নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দিতে রাজি হয়েছিলেন সেদিন। শর্ত ছিল, কবির গানে তিনি ছাড়া অন্য কেউ সুর করে তা রেকর্ড করতে পারবেন না। অবশ্য সেই শর্ত নিজেই পরে ভেঙে ধীরেন দাসকে দিয়ে সুর করে রেকর্ড করিয়েছিলেন স্বয়ং নজরুল। শিল্পী মৃণালকান্তি ঘোষের সেই গানটি ছিল — 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন'।

অদূরে আহিরীটোলায় (১২/২ বাবুরাম ঘোষ লেন) সেই ১৯২৮ সালেই শিল্পী সুকুমার মিত্রের জন্ম। তিনিও পরবর্তীকালে সঙ্গীতাচার্য নজরুল-শিষ্য সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের পাশাপাশি নজরুলের গানের চর্চা করেছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সেই তিনি বেতারে গানগাইবার সুযোগ পান। পরে ভজন, গীত, গজল, দাদরা ও রাগপ্রধানের পাশাপাশি নজরুল সঙ্গীত, কীর্তন ও আধুনিক গান সহ প্রায় সবধরনের গানেই সুকুমার মিত্র সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হন। বিশেষ করে নজরুলের গানে তাঁর নৈপুণ্য ও সাফল্য তাঁকে একালের অন্যতম প্রধান অগ্রজ শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রাতারাতি তিনি অগ্রজ শিক্ষাগুরু হিসেবেও সুনামের অধিকারী হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সুকুমার মিত্র তাঁর সঙ্গীতচর্চা তথা সঙ্গীত পরিবেশনার ক্ষেত্রে ব্যস্ততম একজন সফল শিল্পী হিসেবে পরবর্তীকালে ঈর্ষাযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেশে-বিদেশে, রেকর্ডে, বেতারে বা দূরদর্শনে সর্বত্রই তাঁর অজস্র গানের সফল পরিবেশনায় তিনি জীবিতাবস্থাতেই পেয়েছিলেন কিংবদন্তীর মর্যাদা ও সম্মান।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, নজরুল সঙ্গীতের এই অগ্রজ রূপকার তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ ধ্যানধারণাকে নীরবে সুদীর্ঘকাল ধরে লিপিবদ্ধ করে যেতে সক্ষম হলেও গ্রন্থাকারে তার সমগ্র রূপটি দেখে যেতে শিল্পী সক্ষম হননি। নিরন্তর নজরুলগীতি চর্চার সুবাদে কবির বহুবিধ বৈচিত্র্য ও সুরের গঠনশৈলী বিষয়ে তিনি যথাযথভাবে অবহিত ছিলেন। পরিবেশনার ক্ষেত্রে কোন কোন পদ্ধতি নজরুলের অনুমোদন সাপেক্ষ সে বিষয়েও তাঁর ধ্যানধারণা ছিল সুস্পষ্ট। নজরুলের গানে কোথায় প্রকৃত নান্দনিক আনন্দের উৎস বা পরিবেশনার সংকট সে বিষয়েও গায়ক ও শিক্ষক সুকুমার মিত্রের প্রবল অনুধ্যানজাত জ্ঞান বা উপলব্ধি অর্জিত হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন সময়ে তা লিখেও রাখতেন। ধারাবাহিক সেই উপলব্ধির ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর নজরুল ভাবনা বিষয়ক মতামত নানা সময়ে প্রবন্ধ বা নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পর্বে বেতারে বা দূরদর্শনে সঙ্গীত সহযোগে আপন অভিজ্ঞতালব্ধ বোধের কথাও নানাভাবে তিনি ব্যাখ্যা করতেন। এছাড়া প্রবীণ নজরুল অনুরাগী ও গবেষক সম্প্রতি প্রয়াত সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্তের আগ্রহে ও উৎসাহে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত মেলা আয়োজিত একাধিক সেমিনারে অংশ নেন। চুরুলিয়াতে আয়োজিত নজরুল জন্মোৎসবের মেলায় নজরুল

গীতির নানাদিক দিয়ে সেমিনারে বা অন্যত্র ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন একাধিকবার। একবার দূরদর্শনেও নজরুল গানে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পরিবেশিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করে নজরুল রচিত ছোটোদের গান নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে নিয়ে সেই অনুষ্ঠান করা ছাড়াও দূরদর্শনের একাধিক অনুষ্ঠানে নজরুলের গানে ধ্রুপদী নিষ্ঠা ও রাগ-রাগিণীর মেলবন্ধন বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করতে আমি তাঁকে দেখেছি। ব্যক্তিগতভাবে সেসব অভিজ্ঞতা আজ জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

প্রথম জীবনে শিল্পী বেহালা বাজাতেন বাড়িতে। গলার স্বরক্ষেপণ তাতে ভবিষ্যতে ক্ষতি হতে পারে সেই আশঙ্কায় গান গাইতে শুরু করেছিলেন সুকুমার মিত্র। তাই বলা যায় বেশি বয়সেই তাঁর গান শেখার জগতে প্রবেশ। কিন্তু বেহালা বাজাবার সুবাদে সুরের স্বাদ গ্রহণে তাঁর দক্ষতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কলেজে ছাত্রাবস্থায় আন্তঃকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে গিয়ে সেদিনের বিচারক শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি সফল প্রতিযোগী সুকুমারকে গান শেখাতে চাইলেন। ফলে সিদ্ধেশ্বরবাবুই হলেন তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরু। শিখতে শুরু করলেন ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, পদাবলী, কীর্তন (তিন ঘরানারই) এবং হিন্দুস্থানী গান। প্রথম জীবনে ছাত্রাবস্থায় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় গজল, গীত, খেয়াল, পুরাতনী, বাংলা গান, পল্লীগীতি, পদাবলী ও কীর্তন সহ নয়টি বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কলেজ পড়ুয়া নবীন সুকুমার স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। ফলে তিনি মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই সরাসরি ডাক পেয়ে বেতারে যোগ দেন। পেশাদার সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে জীবন শুরু হয়েছিল তাঁর তখন থেকেই।

গোড়া থেকেই তাঁর ছিল নজরুল গানে সবিশেষ আগ্রহ। গুরু সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ছিল অজস্র অপ্রচলিত নজরুল সঙ্গীতের সংগ্রহ। সেগুলো তাঁর কাছ থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে নিতেন নবীন শিক্ষার্থী শিল্পী সুকুমার। তাঁর মতে — 'নজরুলের গানের মতো এতরকম বৈচিত্র্য তো আর কারো গানে পাওয়া যায় না। এতরকমভাবে তা গাওয়া যায় বলে তখন নজরুলের গানই গাইব ঠিক করলাম। রাধাকান্ত নন্দী, যিনি তখন কীংবদন্তী সমান তবলিয়া সে ছিল আমার বাল্যবন্ধু। ও চাইল আমি নজরুলগীতি গাই, আর ও তাতে বাজাবে।'

পরবর্তীকালে নজরুলগীতিতে মিশ্র রাগ বিষয়েই তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। তাই নজরুলের সুরের ওপর গানের মূল্যায়নে তিনি সাগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থটি সেইসব ভাবনারই লিখিত রূপ।

সৃষ্টিপর্বে মিশ্ররাগের ব্যবহার ছিল নজরুলের অতি প্রিয় একটি প্রবণতা। ফলে বিভিন্ন ঘরানার ছায়াপাত ঘটেছিল তাঁর একাধিক গানে। আগ্রা থেকে কুমারী দীপালি তালুকদার কলকাতায় এসে কৈশোরে নজরুলকে শুনিয়েছিলেন আগ্রা ঘরানার খেয়াল — 'তন মন ধন সব বার আলী'। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের একটি খেয়ালের আঙ্গিকে 'মোর এ মন্দির' অথবা খাঁ সাহেবের 'মোরী আলী পিয়া নহী কাহে মেরা বরষে' যা ছিল গৌড়মল্লার-এ গাওয়া ফৈয়াজের প্রিয় একটি গান, নজরুলকে তাও কবিকে শোনান ষোলো বছরের প্রবাসিনী দীপালি। পরের দিনই দীপালিকে নজরুল সেই একই সুরে ও চালে বাংলায় গানটি বেঁধে বললেন — গাও বাংলায় লেখা এই গান। খাতায় লেখা — 'মেঘ মেদুর বরষায়'। রাগ জয়জয়ন্তী — ত্রিতাল। পরবর্তীকালে অনুরূপ ঘরানায় একাধিক গান লিখেছিলেন নজরুল। যেমন— রুমঝুম রুমঝুম নূপুর বোলে (নটবেহাগ/ত্রিতাল), ঘন দেয়া গরজায় (দাদরা/ঠুমরী), পিউ পিউ বোলে পাপিয়া (বাহার/ত্রিতাল)। আমার মনের বেদনা (ভীমপলশ্রী/ত্রিতাল), ফিরে নাহি এলে প্রিয় ফিরে এল বরষা (গৌড়মল্লার), দূর বেণুকুঞ্জ (আনন্দী/ত্রিতাল), এ কী এ মধু শ্যাম বিরহে (বৃন্দাবনী সারঙ/ত্রিতাল)। এসব গান নজরুলের কাছে শিখে শিল্পী দীপালি নাগচৌধুরী (তালুকদার) তা রেকর্ডে পরবর্তীকালে প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া নজরুলের কাছে তাঁর শেখা আরো গান ছিল। যেমন — আজো বোলে কোয়েলিয়া (রাগ-সিন্ধুরা), আঁচলে শুকায় অভিমানে কালা (মালগুঞ্জী), আঁখি পাতা ঘুমে জড়ায়ে আসে (কাফী-কানাড়া/আড়া চৌতাল), কেন গো যোগিনী বিধুর অভিমানে (যোগিয়া/দীপচন্দী), ধীরে ধীরে আসি (শ্যামকল্যাণ/ত্রিতাল), নিরজন ফুল বন এসো পিয়া (গারা-কানাড়া/ত্রিতাল), ঝিনিকি ঝিনিকি রিনি রিনি রিনি ঝিনি ঝিনি রিনি পায়েল বাজে (ছায়ানট/ত্রিতাল) এবং আসিয়া কাছে গেলে ফিরে (ঠুংরী) ইত্যাদি। এ গানগুলি সম্পর্কে শিল্পী সুকুমার মিত্রের সবিশেষ আগ্রহ মেলে গানগুলির মিশ্ররীতি বিষয়ে সাঙ্গীতিক আলোচনায়। গানের সূত্র ধরে ধরে তিনি তাঁর আলোচনায় নজরুলের সুর-প্রয়োগ ও তাতে বৈচিত্র্যের আনন্দ টুকু উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। লেখার গভীরে নিরন্তর আত্মকথনে মগ্ন একজন শিল্পী সারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে মিশ্র

সুরের সফল ব্যবহারের আবিষ্কারে এখানে যেন নব নব সম্ভাবনার উৎস সন্ধানী। সমকালীন নজরুল গানের সফল শিল্পীদের মধ্যে সাঙ্গীতিক বোধ, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। ধ্রুপদী বা মার্গ সঙ্গীতে তাঁর অনায়াস দক্ষতা তাঁকে এ বিষয়ে আরও উৎসাহী করে তুলেছিল। তাঁর সেই বোধ এবং আজীবন অভিজ্ঞতার ফসল এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আকর্ষণীয় সেই অনুভূতির সঙ্গে নজরুলগীতির উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী ও অনুসন্ধিৎসু শ্রোতারা ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, নজরুলের গানের সেই আশ্চর্য নৈপুণ্য বিষয়ে সেকালে কেউ কেউ সহমত ছিলেন না। বরং নজরুলের গান সম্পর্কে তাঁদের মতামত রীতিমতো বিস্ময়কর। কেউ লিখেছিলেন — এ বৎসর কলকাতায় এসে দেখছি যে, কাজী নজরুলের গান দেশ ছেয়ে ফেলেছে। তাঁর সুরও ঠুংরী গজল নয়। তাঁর দেওয়া অনেকে সুর শুনতে ভালো লাগলেও সুর হিসেবে খুব উচ্চশ্রেণির নয়। সুর সৃষ্টি হিসাবেও তাঁর মূল্য খুব বেশি নয়। অনেক সময় তাঁর সুর বাজারের ঠুংরী গজলের অনুকরণমাত্র। যেখানে তিনি অনুকরণ করেননি, সেখানে তাঁর সুররচনা অত্যন্ত সাদামাঠা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই হালকা সুরের জন্য তাঁর গলা এবং কবিতা প্রধানত দায়ী। তাঁর গলা মোড় খায় না। তাঁর গলায় তাল নেই, মীড় নেই। এই অভাবের জন্য তাঁর রচনার ক্ষতি হয়েছে। — *ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (আজকালকার গান)*। এসব পঁচাত্তর বছর আগেকার সমালোচনা। একালেও হঠাৎ কেউ কেউ লিখে ফেলেন — তাঁর (নজরুলের) গান প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত এলিটিস্টদের মনোযোগ পায়নি। সঙ্গীতের যাঁরা পারদর্শী — যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, অমিয়নাথ সান্যাল, তাঁদের লেখনী নজরুলের গান বিষয়ে কিছু উচ্চারণ করেনি *(সুধীর চক্রবর্তী, কোরক : বইমেলা ১৪০৫, পৃ. ২৬১)*। 'এলিটিস্ট' বলতে বা তাঁদের মনোযোগ বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা ঠিক স্পষ্ট নয়। কিন্তু সেকালে নজরুলের গানের প্রশংসা করেছেন একাধিকবার রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, রথীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বসু, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, দিলীপকুমার রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমনকি প্রমথ চৌধুরীও। বিশেষ করে গানের জগতের দিক্‌পাল যাঁরা যেমন জমীরুদ্দীন খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, নলিনীকান্ত সরকার, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ গুণীজনেরা তো নজরুলের গানের ব্যাপারে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত ছিলেন এবং তাঁর গান গেয়ে বেশ সুনামেরও অধিকারী হয়েছিলেন অনেকেই। এছাড়া নজরুলের গান গেয়েই বিখ্যাত হয়েছিলেন সমকালীন শিল্পীর দল। যেমন শচীনদেব বর্মন, আব্বাসউদ্দীন, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়া, সুপ্রভা সরকার, রাধারাণী দেবী, হরিমতি দেবী, মৃণালকান্তি ঘোষ, উমাপদ ভট্টাচার্য, জ্ঞান দত্ত, শৈল দেবী, যূথিকা রায়, প্রতিভা বসু, কে.এল. মল্লিক, দীপালি নাগচৌধুরী (তালুকদার) প্রমুখ শিল্পীরা। নজরুলের সুখ্যাতিতে রেকর্ডে কয়েকশো গান গেয়ে তাঁরা দীর্ঘকালধরে শ্রোতাদের মন জয় করে গেছেন। এমনকি, স্বয়ং ধূর্জটিপ্রসাদেরও পরে মোহভঙ্গ হয়েছিল নলিনীকান্ত সরকারের লেখা 'আজকালকার গান' -এর প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর *(সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা/আশ্বিন, ১৩৩৬)*। কলকাতার একটি আসরে একবার নজরুলের গান শুনে ধূর্জটিপ্রসাদ ভুলে তা অতুলপ্রসাদের ভেবে সোৎসাহে তারিফ করছিলেন। কিন্তু স্বয়ং অতুলপ্রসাদ যখন এর প্রতিবাদ করে জানালেন যে গানটা তাঁর নয়, নজরুলের, তখন ধূর্জটিপ্রসাদ জানালেন, 'ছন্দের কিছু বৈচিত্র্য আছে বটে কিন্তু মানে নেই।' পরে অবশ্য আবার মতামত দেন — 'তাতে সুরের একটা গতি আছে। কিন্তু সে গতি অত্যন্ত হালকা এবং নিতান্তই একঘেয়ে। তাতে গজল, ঠুংরী, শাউনীর মাধুর্য আনবার প্রয়াস আছে, কিন্তু সে মাধুর্য একেবারে ঝুটা।' সান্ত্বনা এই যে, এই ধূর্জটিপ্রসাদই নলিনীকান্ত সরকারের প্রতিবাদ রচনার উত্তরে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'কাজীর গানকে খুব ভালো বলতে আমি সদাই ইচ্ছুক — মাঝে মাঝে ভালোও লাগে তাঁর গান। তবে যা ভালো লাগে আমার প্রাণে, তাই ভালো বলতে আমি কুণ্ঠিত।' সুতরাং এ বিষয়ে শ্রোতাদের ভ্রান্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম।

আসলে সেই ভালো লাগার কারণেই আজও বেঁচে আছে বাংলা গানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক গানের সম্রাট, বৈচিত্র্যের সুরসাধক কাজী নজরুলের গান। এ বিষয়ে নজরুলের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য। নজরুল বলেছিলেন — আমার নিজের বিষয়ে কিছু বক্তব্য আমার আছে। কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কী দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল তাই আমি সহজভাবে বলেছি। আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনো আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে তখন আমার কথা সবাই স্মরণ

করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। (*'জন-সাহিত্য', নয়া জামানা, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৫*)।

অন্যদিকে, কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ছয়শোর কাছাকাছি বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনার সংখ্যা এখনও প্রায় হাতে গোনা যায়। ওপার বাংলায় গান নিয়ে আলোচনা করেছেন আবদুস সাত্তার (নজরুল গীতিসন্ধানে/১৯৬৮), করুণাময় গোস্বামী (নজরুল গীতিপ্রসঙ্গ/১৯৭৮), সুধীন দাশ, আসাদুল হক, আবুল আজাদ প্রমুখ গবেষকবৃন্দ। পশ্চিম বাংলায় মূলত নজরুলের গান নিয়ে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন কল্পতরু সেনগুপ্ত (নজরুলগীতি অন্বেষা, ১৯৭২)। লিখেছেন ড. অনুপ ঘোষাল (নজরুল গীতির রূপ ও রস/১৯৮৭) ও ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। নজরুল সঙ্গীত বিষয়ে ড. ঠাকুর সর্বাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। যেমন — নজরুল সঙ্গীতের সুর বিকৃতি ও সুর সংরক্ষণ (১৯৯২), নজরুল গীতির নানা প্রসঙ্গ (১৯৯৩), নজরুল সঙ্গীতের বাণীর পাঠান্তর, বিকৃতি ও বাণী সংরক্ষণ, বেতারে নজরুল ও তাঁর গান (১৯৯৮), বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান (১৯৯৫) ইত্যাদি। এছাড়াও নজরুলের গান নিয়ে অনেকেরই বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে কল্পতরু সেনগুপ্ত, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নিতাই ঘটক, যূথিকা রায়, নারায়ণ চৌধুরী, বরদা গুপ্ত, বিমান মুখোপাধ্যায়, ড. অনুপকুমার ঘোষাল, প্রতিভা বসু অমল মিত্র, বসুমিত্র মজুমদার প্রমুখ শিল্পীরা বিভিন্ন সময়ে নজরুলের গান নিয়ে লিখেছেন একাধিকবার। এঁদের অবদানের কথা মনে রেখেও বলা যায়, নজরুলের গান নিয়ে পরিশীলিত ও পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক তথা সারস্বত আলোচনার অভাব পূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন শিল্পী স্বয়ং সুকুমার মিত্র। 'নব মূল্যায়নে নজরুল গীতি ও স্বরলিপি' তাঁর সেই স্বপ্নেরই বাস্তব মূল্যায়ন হিসেবে চিহ্নিত।

এ গ্রন্থ প্রকাশনার আড়ালে প্রয়াত শিল্পীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী কণ্ঠশিল্পী তৃপ্তি মিত্র ও শিল্পীর কন্যা গায়িকা কঙ্কণা রায়ের অবদান সর্বাধিক। এছাড়া তাঁর আত্মীয়বর্গ, তথা শ্রীমান দিলীপ কর এবং শিল্পীর একাধিক ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতার কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়ছে। বিশেষ করে শিল্পী কৃষ্ণা মজুমদার (শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা) ও সুকুমার মিত্রের প্রিয় শিষ্য শিল্পী ভাস্কর ভট্টাচার্যের সহায়তা ভোলবার নয়। স্নেহাস্পদা কৃষ্ণা সাগ্রহে গ্রন্থের স্বরলিপির অংশগুলি যত্ন ও ধৈর্য সহকারে দেখে তার প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন। তবুও যদি অনবধানতাবশত কোনো ভুল থেকে যায় তার জন্যে অন্তত তিনি দায়ী নন। বহুবিধ বিপত্তি ও দ্রুততার সঙ্গে মুদ্রণ করতে বাধ্য হওয়া ও আমার অক্ষমতাই তার জন্যে দায়ী। গায়িকা শ্রীমতী কাকলি সেন আমায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তিনি দীপালি নাগ চৌধুরীর যোগ্য শিষ্যা। সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাই 'পুনশ্চ' প্রকাশনীর উদ্যোগী কর্ণধার স্নেহভাজন শ্রীমান সন্দীপ নায়ককে, যাঁর উৎসাহ ও সাহসী সিদ্ধান্ত ছাড়া সঙ্গীত-বিষয়ক এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশাল এই আকরগ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। সাম্প্রতিক প্রকাশনা জগতে তাঁর গৌরবময় ভূমিকা আরও উজ্জ্বল হোক এই প্রার্থনা।

পরিশেষে বলি, প্রয়াত শিল্পী অগ্রজ সুকুমার মিত্রের সঙ্গে দীর্ঘকালীন পরিচয় ও যোগাযোগের সুবাদে ও প্রয়াত কল্পতরু সেনগুপ্তের দীর্ঘকালীন আগ্রহে এই গ্রন্থের প্রকাশনা ও সম্পাদনা কর্মে আমি যুক্ত হয়েছিলাম। এ কাজে আমার যোগ্যতা বিষয়ে ব্যক্তিগত সংশয়ের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের সহায়তায় যে তা প্রকাশিত হল সেটাই আমার সান্ত্বনা। সম্পাদন কর্মে পাঠক এর যে কোনো ত্রুটি নজরে আনলে তা সবিনয়ে ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংশোধিত হবে।

তথ্যসমৃদ্ধ কাজী নজরুল-বিষয়ক বহুমুখী আলোচনায় স্বরলিপি সমৃদ্ধ এ জাতীয় একাধিক গ্রন্থ নিরন্তর প্রকাশের মাধ্যমে কবির সঙ্গীতভাবনা ও বোধের যথাযথ মূল্যায়ন হোক এই প্রার্থনা। নমস্কারান্তে,

২৬মে ২০০৫
হালিসহর, পোঃ নবনগর
উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩১৩৬

বাঁধন সেনগুপ্ত

দু'একটি কথা

বলতে গেলে যেন অকস্মাৎই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন (১৬ জুলাই, ২০০২/৩১ আষাঢ়, ১৪০৯) আমাদের প্রিয় শিল্পী শ্রদ্ধেয় সুকুমার মিত্র। একালের সঙ্গীতে তিনি ছিলেন এক বিরল প্রতিভার অধিকারী। সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ এই সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র নজরুলের গানের অন্যতম প্রধান রূপকার বা শিল্পীই ছিলেন না। বলতে গেলে সঙ্গীতের প্রতিটি শাখাতেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। ফলে সঙ্গীতের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন আজীবন সফল। একজন সঙ্গীত-শিক্ষক ও সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তিনি ছিলেন সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

শেষদিকে শারীরিক কারণে তিনি কিছুটা বিব্রত থাকলেও সেটা তাঁর সঙ্গীত-বিষয়ক কোনো কাজেই বাধা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। দীর্ঘকাল ধরেই তাঁর মনের কোণে একটি সুপ্ত বাসনা জাগ্রত ছিল। তা হল, কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর বিচারবোধ ও অভিজ্ঞতার নিরিখে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করা এবং তিনি জীবিতাবস্থায় তা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। প্রবল মানসিক শক্তিকে সম্বল করে তাই শেষ বয়সে একটু একটু করে লিখতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হন। চোখের সামনে দেখেছি কীভাবে তিনি দিনের পর দিন উৎসাহের সঙ্গে প্রবল ব্যস্ততা সত্ত্বেও সেই গ্রন্থ রচনার কাজে নিজেকে নিমগ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘাম-ঝরা পরিশ্রমে একাগ্র মনে নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠায় এই গ্রন্থ রচনার সাধনায় তিনি শেষপর্যন্ত ছিলেন অবিচল। জাগতিক বা সাংসারিক কোনো চিন্তাই তাঁকে তখন দূরে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়নি। তাঁর সেই তন্ময়তা, নিষ্ঠা ও আত্মমগ্নতার কথা আজ বারবারই মনে পড়ে। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর সেই নিমগ্নতা ছিল অপরিসীম। সঙ্গীতের জন্য তাঁর সেই অফুরান ভালোবাসা ও অন্তহীন কৌতূহল-মিশ্রিত পরিশ্রমের ফসল বর্তমান এই গ্রন্থ। তাই আশা করি, নজরুল-গীতির সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রবীণ এই শিল্পীর অবদান ও মতামত নিঃসন্দেহে উত্তরসূরিদের তথ্য ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে আগামীদিনে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

নজরুলের গানে মূলত মার্গ বা ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিস্ময়কর ও সফল সংমিশ্রণ আমাদের মুগ্ধ করে। এর সবিস্তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং বৈদগ্ধ্যের ব্যাপ্তি গবেষণালব্ধ সূত্রে অর্জিত জ্ঞানের আধারে বিকশিত হওয়ার যোগ্য। দীর্ঘকালীন শিল্পীজীবনে নজরুল চর্চায় ও গবেষণার মৌলিকতায় এই লেখক নিঃসন্দেহে আজীবন স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। ভবিষ্যতে তাঁর সেই স্বোপার্জিত উপলব্ধি সঙ্গীত-রসিক সমাজ ও সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের কাছে নিশ্চয়ই সমান মর্যাদায় স্বীকৃত, সমাদৃত ও পুরস্কৃত হবে।

নজরুল সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অভূতপূর্ব মেলবন্ধনের সুনিপুণ বিশ্লেষণ তথা আশ্চর্য সফল সংমিশ্রণ এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। শিল্পী সুকুমার মিত্রের স্বকীয় ভাবনা, অবদান এবং বিশ্লেষণ তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের চিহ্ন এর প্রতিটি ছত্রে বিধৃত। নজরুলের গান আজীবন এই শিল্পীর প্রাণে-মনে, দেহে-মজ্জায় যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। নজরুল সঙ্গীত ও তার যাবতীয় তথ্যাদি বহু গুণীজনের কাছ থেকে এবং পুরনো রেকর্ড থেকে সংগ্রহ করে রাখবার নেশা ছিল তাঁর ছোটোবেলা থেকে। সেই অনুসন্ধিৎসার ফলে পরবর্তীকালে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের ভাণ্ডারটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফসল এই গ্রন্থ তাঁর গানের মতোই স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ।